আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস - প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

আবুল বাশার

২০০০ সালের ৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘের ৫৫তম সাধারণ পরিষদের সভায় ১৮ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিকভাবে অভিবাসী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেই থেকে অভিবাসী কর্মীদের মর্যাদা প্রদান, অধিকার সংরক্ষণ ও দেশের অর্থনীতিতে তাদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে এবং অভিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ ২০০০ সাল থেকে ১৮ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এর আগে সমগ্র বিশ্বে অভিবাসী শ্রমিকের দুর্ভোগ, দুর্দশা এবং তাদের ওপর সহিংসতা, নিপীড়ন ও নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এবং 'অভিবাসী শ্রমিকের অধিকার- মানবাধিকার' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর একটি অভিবাসী সনদ অনুমোদন করে। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত প্রতিটি দেশও দিবসটি পালন করে আসছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও ব্যাপক কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালন করে থাকে। তবে বাংলাদেশে ১৯৯৭ সাল থেকে সিভিল সমাজ আন্তর্জাতিক অভিবাসন দিবসটি পালন করে আসছে। গত চার বছর ধরে সরকার এ দিবসটি পালন করছে।

এবার আসা যাক অভিবাসনের ইতিহাসে। সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ ভালোভাবে বাঁচার আশায় নিজ বাসস্থান ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি জমিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতেও মানুষের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল থেমে নেই। বরং সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তা নতুন রূপ নিয়েছে। অভিবাসনের ধরনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এখন শুধু আর কয়েক হাজার বা লাখো ব্যক্তি নয়, কয়েক কোটি লোক সাগর- মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে, রেলপথে বা অবৈধ পথে সীমান্ত পেরিয়ে নিজের সৌভাগ্যের সন্ধানে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে বিশ্বের ৩৫ জনের মধ্যে ১ জন অভিবাসী হচ্ছে— যিনি নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে অন্য কোনো দেশে চাকরি ও বসবাস করছেন। পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাস বলে মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশ আদিবাসী বা উপজাতি। এ হিসাবে বাকি ৯৫ শতাংশ অধিবাসীকে অনেকে অভিবাসী হিসেবে বর্ণনা করে। এ কারণে পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর ইতিহাসকে যাযাবরের ইতিহাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অভিবাসন প্রক্রিয়ার প্রাচীন ও বর্তমান রূপ ভিন্ন হলেও পুরো বিশ্বের মানুষ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান। মানবসভ্যতার এ গতি যত সাবলীল হবে, এ সভ্যতার উতকর্ষ তত বাড়বে। যদিও বিগত কয়েকশ' বছরের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, মানবের এ গতি ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে। শুধু ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা নয়, অন্যান্য বিষয়ও এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। একেক দেশ তার ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে, অন্য দেশের ওপর বৈষম্য বজায় রাখতে মানব চলাচলের অবাধ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করছে।

ওয়াশিংটনের মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউটের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, সংযুক্ত আরব আমিরাতের মোট জনসংখ্যার ৭১ শতাংশ অভিবাসী অর্থাত্ অন্য অঞ্চল থেকে আসা অধিবাসী। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার ৪০ শতাংশ লোক অভিবাসী। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে অভিবাসনের হিড়িক শুরু হয়েছিল মূলত ১৯৭০- এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে, নব্বইয়ের দশকের শেষ প্রান্তে অভিবাসিতদের মোট সংখ্যাটা পৌঁছে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৩ শতাংশে। আর এখন তা দুই ও তিন শতাংশের মাঝামাঝি। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অভিবাসী কর্মীদের পাঠানো প্রবাসী আয় ওইসব দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক সাহায্য তহবিলের পরিমাণ থেকেও অনেক বেশি। এসব দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তির অন্যতম রেমিট্যান্স। দেশগুলোর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে প্রবাসীদের পাঠানো আয়। আন্তর্জাতিক অভিবাসনের হার গত ২০০০ সালে তিন শতাংশ ছিল এবং তা গত ১০ বছরে অনেক বেড়েছে। কিন্তু সে তুলনায় অভিবাসী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ তেমন একটা বাড়েনি।

বর্তমানে এশিয়ার প্রায় সাড়ে ৬ কোটি অভিবাসী শ্রমিক বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছে। প্রতিবছর প্রায় ৩০ লাখ এশিয়ার শ্রমিক এই শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে। মূলত দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার একটি বড়সংখ্যক শ্রমিক গালফভুক্ত দেশ, উত্তর আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত দেশ, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে কর্মরত। এই শ্রমবাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকরা নির্মাণ শ্রমিক, পোশাক শ্রমিক, গৃহকর্মী হিসেবে কর্মরত। বাংলাদেশের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় ৭০ লাখের বেশি শ্রমিক বিভিন্ন দেশে কর্মরত। এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অভিবাসী চীনের। এরপরের অবস্থানে রয়েছে ভারত। প্রবাসীদের পাঠানো আয়ের দিক থেকেও এ দুটি দেশ সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স সংগ্রহকারী দেশ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও ভুটান। মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে এসব দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না বাংলাদেশ।

বাংলাদেশে অভিবাসন নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত বিষয় জনশক্তি রপ্তানির ভয়াবহ মন্দা। বর্তমানে বাংলাদেশে বৈধ পথে জনশক্তি রপ্তানি খাত থেকে বছরে প্রায় সাড়ে ১১ বিলিয়ন ডলার বা ৮০ হাজার কোটি টাকা আয় হয়। অবৈধ পথেও আসে এর চেয়ে কম নয়। সরকারের হিসাবে প্রায় ৭০- ৭৫ লাখ মানুষ বিদেশে কাজ করে। সম্পূর্ণ বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টায় জনশক্তি খাতে আমাদের সাফল্য অর্জিত হয়েছে। সরকারের সামান্য উদ্যোগের ফলেই এ আয় দ্বিগুণ করা সম্ভব। পরিকল্পিত উদ্যোগ নিতে পারলে মাত্র পাঁচ বছরে শুধু জনশক্তি রফতানি আয় ৫০ বিলিয়নে উন্নীত করা সম্ভব। গত দু'বছরে দেশের ভেতরে সরকারিভাবে কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে মাত্র ২৩ হাজার লোকের। অথচ গত প্রায় তিন বছরে বিদেশে গেছেন প্রায় ১১ লাখ বাংলাদেশি। অদক্ষ কর্মীদের বেশিরভাগই কাজ করেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয়। কিন্তু বর্তমানে সম্ভাবনাময় এ খাত ভয়াবহ সংকটে পড়েছে। গত ৩- ৪ বছর ধরে চলতে থাকা অচলাবস্থা কেটে যাওয়ার লক্ষণ নেই। অপ্রিয় হলেও সত্যি যে, বাংলাদেশের প্রধান শ্রমবাজার সবগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, কুয়েত, কাতার একসময় লোক নেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অগ্রাধিকার দিলেও এখন একেবারেই মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন। এসব দেশ এখন লোক নিচ্ছে হিন্দু প্রধান দেশ নেপাল ও ভারত থেকে। এখন আমাদের একমাত্র বাজার সংযুক্ত আরব আমিরাত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে সুদীর্ঘ ৪০ বছরে, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিস(বায়রা) এর সদস্যদের সহায়তায় প্রায় ৮০ লাখ বাংলাদেশি কর্মী বিভিন্ন পেশায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছে। ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত তাদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ প্রায় ৮০ বিলিয়ন ডলার। বর্তমানে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার। কেবল ২০১০ সালে প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ১১ বিলিয়নের বেশি, যা মোট বৈদেশিক সাহায্যের ৭ গুণের অধিক এবং জিডিপিতে এর অবদান ১২ শতাংশ।

বর্তমান বাজেট প্রাক্কলনকালে দেশের আয় মাথাপিছু ৬৯০ ডলার ধরা হয়েছে। বিদেশে কর্মরত ৭৫ লাখ কর্মী দেশে অবস্থান করলে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ন্যূনতম ১০০ টাকা হিসাবে বছরে ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা খরচ হলেও ৩.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হতো, ফলে ৯.০২ বিলিয়ন + ৩.৩৯ বিলিয়ন = ১২.০৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জাতীয় আয় হ্রাস পেত অর্থাৎ মাথাপিছু আয় ১৩ শতাংশ হ্রাস পেত। ৬৫ লাখ অভিবাসী কর্মী ৬৫ লাখ পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও উন্নততর জীবন ব্যবস্থার প্রচেষ্টা নিয়েছে। তারা দেশের অভ্যন্তরে থাকলে দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি, সামাজিক, সন্ত্রাস ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতো। তাই বাজেটে ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিশ্ব শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সঙ্গে অধিকহারে দক্ষ ও পেশাজীবী কর্মী প্রেরণের জন্য জাতীয়ভাবে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া একান্ত অপরিহার্য। আমাদের প্রচলিত বাজারে লিবিয়া, বাহরাইন, জর্ডান ছাড়াও সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ওমান, মালয়েশিয়া অনেকদিন থেকে প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। তাই আজ আমাদের সময় এসেছে নতুন শ্রমবাজারের সন্ধান করে সেখানকার চাহিদা অনুযায়ী শ্রমবাজার তৈরি করা।